অবিস্মরণীয়
৭ নভেম্বর

সম্পাদক

আবদুল হাই শিকদার

সার্বিক সহযোগিতায়

জামান সৈয়দী
মিথুন কামাল
শাহিদ উল ইসলাম

মনন প্রকাশ

মনন প্রকাশ- সংস্করণ প্রসঙ্গে

প্রথম প্রকাশের ২৩ বছর পর মনন প্রকাশের শাহ আল মামুনের কল্যাণে আবার পাঠকের দরবারে সগৌরবে উপস্থিত হলো অবিস্মরণীয় ৭ নভেম্বর।

শেষের ১৭ বছর বাংলাদেশ দখল করেছিল ৭ নভেম্বরের পরাজিত শত্রুরা। ইতিহাসের এক নিকৃষ্টতম ফ্যাসিস্ট স্বৈরশাসনে বন্দী ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার 'অপরাধে' জনগনকে, রাজনৈতিক দলগুলোকে সইতে হয়েছে অবর্ণীয় নির্যাতন। যন্ত্রনায় দগ্ধীভূত হতে হয়েছে 'অবিস্মরণীয় ৭ নভেম্বর'কেও।

তারপর ১৭ বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর, ছাত্র জনতার অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগ ও প্রাণের বিনিময়ে সংঘটিত হয় জুলাই গণঅভূত্থান। দেশ মুক্ত হয় আধিপত্যবাদের তাবেদার, স্বাধীনতা বিরোধী স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট হাসিনার হিংস্র থাবার নীচ থেকে। এ যেন ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বর বিপ্লবেরই সম্প্রসারিত উত্থান। একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালিত হয়েছে দু'টি ঘটনাই। ফলে নতুন করে ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবকে অনুধাবন করা আজ আরও বেশী প্রাসঙ্গিক। যারা ৭ নভেম্বরের চেতনাকে ধারণ করেন তারাই অনুভব করতে পারবেন জুলাই বিপ্লব ২০২৪ এর মর্মার্থ।

যাহোক, আজ আবর্জনামুক্ত স্বাধীন দেশে স্বাধীনতা প্রিয় জনগণের সামনে 'অবিস্মরণীয় ৭ নভেম্বর' উপস্থিত করতে পেরে কৃতার্থ বোধ করছি।

একুশে বইমেলা ২০২৫ **আবদুল হাই শিকদার**

ভূ মি কা

৭ই নভেম্বরের মতো ঘটনা প্রতিদিন ঘটে না। এ রকম আবেগ, আনন্দ এবং দায়িত্ববোধ সঞ্জীবিত দিনের জন্য একটি জাতিকে অপেক্ষা করতে হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী। কখনো হাজার বছর।

আমাদের জীবনে এ ধরনের ঘটনা ১১৮ বছর আগে আরেকবার ঘটেছিল ১৮৫৭ সালে। যাকে সাদা চামড়ার ঐতিহাসিকগণ 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে অভিহিত করেছেন। আসলে ওটা ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী উপমহাদেশের প্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ।

তবে ৭ই নভেম্বরের সাথে একটা পার্থক্যও আছে ওই ঘটনাটির। যদিও দুটি ঘটনার কেন্দ্রেই 'স্বাধীনতা' শব্দটি, তবুও আগেরটি ছিল স্বাধীনতা উদ্ধারের যুদ্ধ। আর পরেরটি স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম। মিল হলো, দুটিই আগ্রাসন, আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হয়েছিল পরিচালিত। একটির প্রতীক বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট কবি বাহাদুর শাহ জাফর, অন্যটির প্রাণ স্বাধীনতার মহান ঘোষক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, তারুণ্যে উদ্বেল জিয়াউর রহমান– দু ক্ষেত্রেই সংগঠক ও চালক সাধারণ সৈনিক-জনতা।

আসলে আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে দিল্লির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের হাজার বছরের যে ধারাবাহিক স্বাধীনতাসংগ্রাম, ৭ই নভেম্বর তার সবচেয়ে উজ্জ্বল শিখরটি।

সংগত কারণেই আধিপত্যবাদ এবং এর দোসররা পরদিন থেকেই এই অবিস্মরণীয় ঘটনাটির মহিমা, তাৎপর্য, গুরুত্ব এবং আমাদের জীবনের গভীরতর চেতনায় খচিত এই অনন্য সাধারণ ঘটনাটিকে ছোট করবার জন্য, নানা কায়দায় একে ম্লান করবার জন্য, তুচ্ছ করবার জন্য, জাতীয় ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার জন্য, একের পর এক চালিয়েছে জটিল, কুটিল ও নোংরা ষড়যন্ত্র। এক্ষেত্রে তাদের সহায়ক হয়েছে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির মোহে আত্মা বিক্রয়কারী একশ্রেণির বর্ণচোরা বুদ্ধিজীবী। যদিও তারা জানে, এটা একটা দুরূহ কর্ম। তবুও তারা শরীর থেকে আত্মা, দুধ থেকে সাদা রংটি বিচ্ছিন্ন করার জন্য নিরন্তর চালিয়েই যাচ্ছে অপকৌশল।

অন্যদিকে নভেম্বর বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে, তাকে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি মানব হৃদয়ের ভেতরে সঞ্চার করার কাজটি যাদের ছিল, তারা কিছুটা শ্লথগতিসম্পন্ন। ক্ষেত্রবিশেষে উদাসীন। দু-একটি প্রবন্ধ-নিবন্ধ আর চোয়ালসর্বস্ব জনসভায় তোতাপাখির বোলচালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে সবকিছু। আর উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব তো সর্বত্রই। মেধাবী, পরিশ্রমী ও উদ্যমী গবেষকরা কঙ্কে পান না। গ্রাহ্য গবেষণা যেখানে নেই সেখানে অদরকারি লাফালাফি না সয়ে উপায় কী?

অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডত্ব, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও মর্যাদা রক্ষার স্বার্থেই আমাদের নিরন্তর ৭ই নভেম্বর বিপ্লবের চর্চা করতে হবে। কারণ ৭ই নভেম্বরের পথই হলো বাংলাদেশের পথ, বাংলাদেশের টিকে থাকার পথ। অন্যপথ ও অন্য মতে চলার অর্থ হলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকভাবে মহাভারতে বিলীন হয়ে যাওয়া।

ধ্বংস আর লয়ের বিরুদ্ধে অহংকে বুলন্দ করার তাড়া থেকেই আমাদের এই গ্রন্থের আয়োজন। এ গ্রন্থ গবেষণাগ্রন্থ হয়তো নয়। কিন্তু টুকরাটাকরাভাবে যেখানে যা ছাপা হয়েছে এদেশে, নভেম্বর বিপ্লবকে নিয়ে, প্রাথমিকভাবে তার সবকিছুকে একত্রিত করা তো হলো। তাই বলে সকলের সব লেখাও যে এখানে আছে তাও অবশ্য বুকে হাত দিয়ে বলা যাবে না। সে সীমাবদ্ধতা মেনেও বলছি, একটা আকর তো হলো। এখন এই আকর থেকে যে কেউ একত্রে সবকিছু পেয়ে, বড় কোনো কাজে হাত দেবেন। খুলে যাবে গবেষণার দরোজা। যদি তাও না হয়, অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকবে, আমাদের মনীষী, গবেষক, লেখক, বুদ্ধিজীবীদের '৭ই নভেম্বর' চিন্তাটুকু দু মলাটের মাঝে একসঙ্গে যে করতে পারলাম, তার মূল্যও তো কম নয়।

আলমগীর হোসেন খান, আমাদের তরুণ লেখক বন্ধু। সে হলো যোগসূত্র। আর বাড কম্প্রিন্টের মোহাম্মদ শিহাব উদ্দিন বাড়িয়ে দিলেন হাত। এভাবে ঝুমুর সম্পাদক বেলায়েত হোসেন এবং স্টাডি সার্কেলের নূরুল আমিন দুদু কিছু ভালোবাসা তো দাবি করতেই পারেন।

সহকর্মী জামান সৈয়দী, মিথুন কামাল, শাহিদ উল ইসলাম তো ধন্যবাদের মুখাপেক্ষী নন। তাঁরা এ গ্রন্থের প্রাণ।

ধ্রুব এষের প্রচ্ছদ সব সময়ই আমার ভালো লাগে।

একুশে বই মেলা ২০২২ **আবদুল হাই শিকদার**

বিপ্লব ও সংহতি দিবস

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

আমাদের এ বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবনে নভেম্বর একটা মস্তবড় চিরস্মরণীয় দিবস। এ দিবসেই একটা মস্তবড় বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষের মধ্যেও এক অনন্য সংহতির সৃষ্টি হয় এবং প্রায় দুশতাব্দীর মতো সময়ে এদেশীয় মুসলিম সমাজ একদিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী অপরদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যে স্বাধীনতা লাভ করেছিল অচিরেই দেখা গেল তাতে রয়েছে এক মস্তবড় ফাটল। ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দেশ বিভাগ হলেও উক্ত প্রস্তাব অনুসারে একাধিক রাষ্ট্র না হওয়ায় পরবর্তীকালে দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা এ অঞ্চলকে তাদের শোষণের ও শাসনের এক ভূখণ্ড বলে গণ্য করে। তারা বিজয়ী ইংরেজ বণিকদের স্থলবর্তী হয়ে এদেশবাসীর ওপর শোষণ ও শাসনের রোলার চালাতে চায়। ফলে এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। প্রথমে ভাষা আন্দোলন, পরে স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষার জন্য শেরে বাংলা ফজলুল হক, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, জনাব শামসুল হক, আবুল মনসুর আহমদ, অধ্যাপক আবুল কাসেম, জনাব অলি আহমদ, আতাউর রহমান, শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পর্যায়ে যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন তা ছিল ঐতিহাসিক। বিশেষ করে ষাটের দশকে পশ্চিম পাকিস্তানি অবিচার থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য ভাসানী ও মুজিব যে সংগ্রাম করেছেন তাও এদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েই রয়েছে। ভাষা আন্দোলনের ফলে এদেশীয় জনসমাজের মানুষের জীবনে যে ঐক্যচেতনার সৃষ্টি হয় তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ দেখা দেয়। সে ঐক্য আরো দৃঢ় হয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করে। পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান এদেশে ফিরে এসে এদেশের জনসাধারণের নিকট একচ্ছত্র নেতারূপে পরিচিত হন এবং দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করেন। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধে প্রভূত সাহায্য করায় তিনি এদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য ভারতের ইচ্ছাক্রমে রক্ষীবাহিনীকে প্রচুর কর্তৃত্বদান করেন। ভারতীয় বাহিনী দীর্ঘকাল এদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত থেকে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও সমরাস্ত্র ভারতে চালান দেয়। তার ওপর তিনি এদেশের ধর্মীয় অনুভূতির মূল্য না দিয়ে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বলেও ঘোষণা করেন। যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মুসলিম বা ইসলামের যোগ ছিল সেগুলো থেকে তা মুছে ফেলেন। এভাবে দেশের সর্বত্র বাঙালি জাতীয়তার নামে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নানা প্রচেষ্টা চলতে থাকে। এসবের ফলে এদেশবাসী মুসলিম সমাজ তাঁর প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করতে থাকে। তা ছাড়া শেখ মুজিব সরকারি ৪টি পত্রিকা বাদে সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ ঘোষণা করেন এবং সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে একদলীয় বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রের মূলে এক হিসেবে কুঠারাঘাত করেন। তবুও এদেশীয় জনসমাজ তাঁর পূর্বকৃত আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের জন্য তাঁর এ গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল। তবে তাঁর অনুচর ও সহকর্মীগণের নানা বিষয়ে স্বৈরাচারী কার্য-কর্ম প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমশ বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ পায়। এই পটভূমিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। অভ্যুত্থানের নেতা ও কর্নেল রশিদ প্রেসিডেন্ট পদে বসালেন খোন্দকার মোশতাক আহমদকে। এদের পরামর্শ মতো মোশতাক জেনারেল জিয়াকে করলেন চিফ অব স্টাফ, তবে পদটির মর্যাদা ও ক্ষমতা অনেক কমিয়েছিলেন, সবার ওপরে ডিফেন্স উপদেষ্টা হিসেবে বসানো হলো জেনারেল এম এ জি ওসমানীকে। এরপর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিলের পাল্টা ক্যু'র প্রচেষ্টা শুরু হলো। তারা ২ নভেম্বর রাতে জিয়াকে গৃহবন্দি করলেন এবং ২ নভেম্বর মোশতাক সরকারের পতন ঘটালেন। ব্রিগেডিয়ার বিপ্লবের শুরুতে ২ নভেম্বর রাত্রিতে জিয়াকে বন্দি করা হলেও, জিয়া ছিলেন যেমন নিরপেক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ, তেমনি নিঃস্বার্থ ও নিরহংকার। বিক্ষুব্ধ সিপাইরা এতে বিদ্রোহ করল। জিয়ার গুণমুগ্ধ বিদ্রোহী সেপাইরা জিয়াকে ৭ই নভেম্বর বন্দিদশা থেকে অযাচিতভাবে মুক্ত করে এবং অযাচিতভাবেই তাঁকে করে বিপ্লবের নেতা। এরপরে প্রেসিডেন্ট সায়েমের সরকারও অযাচিতভাবেই তাঁকে করে সেনাবাহিনীর প্রধান (Chief of staff) (জিয়াউর রহমান স্মারক গ্রন্থ, ছদরুদ্দীন পৃ. ৩০-৩ ও ৩০৬)। এ জন্যই ৭ই নভেম্বর এদেশের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় দিন হিসেবে রয়েছে। সেদিন যদি বিদ্রোহী সিপাইরা তাঁকে মুক্ত না করত এবং তাঁকে তাদের নেতারূপে বরণ না করতো তাহলে সেদিনই এই নেতৃত্বহীন

সিপাই অভ্যুত্থান থেকে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়ে এদেশ ছারখার হয়ে যেত। এ বিদ্রোহী সিপাইদের আস্থাভাজন নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতা ঘোষণাকারী জিয়ার নেতৃত্বে এদেশবাসীর জীবনে যে সকল মঙ্গল সাধিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দৃঢ় করা, দেশকে স্বনির্ভর করার সকল রকমের চেষ্টা করা, সার্ক গঠন করে প্রতিবেশী ও অপরাপর দেশের সঙ্গে সার্বভৌমত্বভিত্তিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মকে রক্ষা করে সমাজজীবনের নৈতিক উন্নতি সাধন প্রভৃতি কার্যাবলি। এজন্যই ৭ই নভেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় স্থান রয়েছে, যা এদেশবাসী জনসাধারণের কাছে এক মহান দিন বলে গণ্য।

৭ই নভেম্বর : আমার অনুভূতি

সৈয়দ আলী আহসান

আমি তখন রাজশাহীতে। বেশ কিছুদিন যাবৎ ঢাকায় গোলযোগের সংবাদ শুনছি এবং সেজন্য মানসিকভাবে অস্থির ছিলাম। তিন তারিখে জেল হত্যাকাণ্ড ঘটল এবং সেজন্য আমার অস্থিরতা ছিল। চার তারিখে কামরুজ্জামানের লাশ রাজশাহীতে এল। তাঁর জানাজায় যাবার নাম করে কিছু ছাত্র আমার অফিসের সামনে বিক্ষুব্ধতা প্রদর্শন করেছিল। আমি সে কারণে একটু চিন্তিত ছিলাম। অবশ্য ছাত্ররা দলে ভারী ছিল না। তারা মুখেই নানা রকম আওয়াজ তুলেছিল। যাই হোক, নভেম্বর মাসের তিন ও চার তারিখ কোনোরকম দুর্ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল। সে সময় বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি এবং রাজশাহীর ডিসি আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, কোনোরকম অঘটন যেন না ঘটতে পারে সেজন্য তাঁরা ব্যবস্থা নেবেন। ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবনের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হলো এবং কিছু সংখ্যক টহলদার পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হলো। ঢাকার সঙ্গে সর্বপ্রকার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এই বিচ্ছিন্নতা পুরোপুরি কয়েক দিন বজায় ছিল।

রাজশাহীতে একটি ছোট আর্মি ইউনিট ছিল। তার কমান্ডেন্ট ছিল এক যুবক মেজর। তার নাম ছিল মেজর খালিকুজ্জামান। তার সঙ্গে ইউনিভার্সিটির সকলের হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। মাঝে মাঝে তার ওখানে আমি নৈশভোজে যোগদান করেছি। আমার বিশ্ববিদ্যালয় বাসভবনে তাকে আমি আপ্যায়নও করেছি। ঢাকার সঙ্গে টেলিফোনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমি খালিকুজ্জামানকে টেলিফোন করতাম এবং খালিকুজ্জামান আমাকে ঢাকার খবর প্রয়োজন মতো দিত। ঢাকায় তিন তারিখে জেলহত্যা যখন হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে রাজশাহীতে এ খবর যায়নি। আমরা সুস্পষ্ট খবর পেয়েছিলাম বেলা ১০ টা-১১টার সময়। খালেকুজ্জামানই এ খবর আমাকে দিয়েছিল। ৩ নভেম্বরের ঘটনার পর একটি ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা ইউনিভারর্সিটি মহলে দেখা দিয়েছিল। সর্বপ্রকার আশ্বাস পেলেও সম্পূর্ণ ব্যাকুলতা পুরোপুরি দূর হয়নি। ছাত্রদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাত্র গোলযোগ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে তারা কিছু শ্লোগান দিয়ে সরে গিয়েছিল। চার তারিখে সিন্ডিকেটের জরুরি মিটিং ছিল। স্থানীয় একজন উকিল সিন্ডিকেটের মেম্বার ছিলেন। তিনি ছিলেন আওয়ামীপন্থি। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তিনি মিটিং বন্ধ করে দিতে বললেন। আমি মিটিং মুলতবী করে দিলাম এবং পরবর্তী তারিখ পরে ঘোষণা দেওয়া হবে এ কথা বললাম।

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে দেশে কি হতে যাচ্ছে। কমিশনার এবং পুলিশের শত আশ্বাস সত্ত্বেও আমি কেন যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া বিশেষ দেখা যায়নি। মুষ্টিমেয় কয়জন ছাত্র শ্লোগান দিতে দিতে আমার অফিস ঘরের সামনে আসে এবং তারপর চলে যায়। জেলহত্যার জন্য আমি চিন্তিত ছিলাম। যে কোনো জেলই একটি অবরুদ্ধ জায়গা। সেখানে বন্দিদশায় যারা বাস করে তারা একটি বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে যে বাইরের কোনো শক্তি তাদের আক্রমণ করবে না। কিন্তু এ নিশ্চিন্ততা আমাদের দেশে মিথ্যা প্রমাণিত হলো। সুশীল এবং নিরপেক্ষ মানুষ এই প্রকার হিংস্রতা কখনোই অনুমোদন করতে পারে না। তেসরা নভেম্বরের

হত্যাকাণ্ডের পর আমি কয়েকদিন নিশ্চিন্তে থাকতে পারিনি। যাঁরা নিহত হলেন তাঁদেরকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানতাম। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে দুঃখবোধ ও বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছিল।

তিন এবং চার তারিখ একটি মানসিক অশান্তির মধ্যে কাটল। পাঁচ তারিখে রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, এসপি এবং আর্মি কমান্ডেন্ট আমার বাসায় নৈশভোজে যোগ দিলেন। দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাঁরা খোলাখুলি আলোচনা করলেন। কমিশনার আলোচনার মধ্যে একবার বললেন, "ঘটনা সব ঘটছে ঢাকায়। আমরা শুধু বিচলিত বোধ করছি শুনে। ভবিষ্যতে আবার যে কি হবে আমি বলতে পারি না।" খালিকুজ্জামান বললেন, "আমার মনে হয় সেনা-সদস্যদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া জাগবে। প্রতিক্রিয়া কি হবে তা আমি বলতে পারছি না, কিন্তু হবেই যে সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত আমার কাছে অল্প সংখ্যক সেনা আছে। তাদের মনোভাব আমি বুঝতে পারি।"

ঢাকার সঙ্গে আবার যোগাযোগ বন্ধ হলো ৭ই নভেম্বর সকালে। আমি বিচলিত বোধ করলাম এবং খালিকুজ্জামানকে টেলিফোন করলাম। খালিকুজ্জামান বলল, "আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না ঢাকায় কি হয়েছে? তবে আমি চেষ্টা করছি ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। কিছু খবর পেলেই আপনাকে জানাব।" দুপুর বারোটা। সে সময় একজন পিএইচডি গবেষক আমাকে একটি অনুরোধ জানাতে এসেছিলেন যে তাঁর গবেষণার জন্য যে সমস্ত পুস্তকের প্রয়োজন সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নেই। সেগুলো তার কিনতে হবে এবং এজন্য টাকার প্রয়োজন। আমি তাঁকে বললাম, "তোমাকে গবেষণার জন্য বৃত্তি দেওয়া হয়েছে, তার উপরও আমি তোমাকে কাগজ ও বই কেনার জন্য কিছু টাকা দিয়েছি। সুতরাং আবার নতুন করে তোমাকে টাকা দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।" এ সময় হঠাৎ খালিকুজ্জামানের টেলিফোন এল। তার কণ্ঠস্বর বেশ উৎফুল্ল। সে বলল, "একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটেছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা ক্যান্টনমেন্টগুলো থেকে বেরিয়ে পড়েছে এবং জনতার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। 'সিপাহী-জনতা ভাই-ভাই' এই শ্লোগান তারা দিচ্ছে।" আমি এ সংবাদে উৎফুল্ল হলাম। আমাদের সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ আমলে যে প্রশিক্ষণ ছিল সেই প্রশিক্ষণে তারা লালিত। তারা সাধারণত এর ব্যতিক্রম করতে জানে না। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে যে সেনাবাহিনী তৈরি করেছিল সেই সেনাবাহিনীকে তৈরি করা হয়েছিল জনতার বিপক্ষে দাঁড়াবার জন্য। তারা যে জনতার বিপক্ষে দাঁড়াত তার বহু নিষ্ঠুর প্রমাণ আমরা পেয়েছি। জালিয়ানওয়ালাবাগে জনতার ওপর যে নিষ্ঠুরতা চালানো হয়েছিল তা একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হয়ে রয়েছে। সেখানে নিরস্ত্র জনতার বেরোবার পথ রুদ্ধ করে নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। সৈন্যরা প্রভুর আদেশ মেনেছিল নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং জনতার কথা তারা ভাবেনি। কারণ সেভাবে ভাবতে তাদের শেখানো হয়নি। ব্রিটিশের এই শিক্ষার ধারায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কিন্তু দেশের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড দেখে তাদের মানসিকতার যে পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তা কেউ বুঝতে পারেনি। তারা আমাদের মধ্য ও উচ্চ ঘরের সন্তান। মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগ্নীর সমন্বয়ে যে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয় তা তারা জানে এবং এটাও তারা অনুভব করে যে তারা কোনো ভিন্ন গোত্রের মানুষ নয়। এটা তাদের শিখতে হয়নি। এটা এক ধরনের সামাজিক অঙ্গীকারের মতো। বাংলাদেশের এই সাহসী সৈনিকরা ৭ই নভেম্বর জনতার পক্ষ অবলম্বন করেছিল, বহিরাগত কোনো শক্তির আনুগত্য তারা স্বীকার করেনি। নিজেদের অনুভূতি এবং মানসিকতার কাছে তারা নিজেদের দায়বদ্ধ ভেবেছিল। সে কারণে তারা তখন নির্দেশিত পথে হাঁটেনি। তারা হাঁটতে চেয়েছিল জনতার সঙ্গে সঙ্গে। এটা একটি নতুন অনুভূতি এবং বিস্ময়কর অনুভূতি। ৭ই নভেম্বরের অনুভূতিকে যারা মেনে নিতে চাননি তারা একটি বিকলাঙ্গ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ৭ই নভেম্বরের সূত্র ধরেই শহীদ জিয়ার আবির্ভাব আমাদের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে।

বিগত পাঁচ বছর এই ৭ই নভেম্বরকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। যারা উপেক্ষা করেছিল তারা স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এখন আবার জনতার মুক্তি ঘটেছে এবং তারা ৭ই নভেম্বরের ঘটনার স্মৃতিতে নতুন অনুষ্ঠানসূচি গ্রহণ করেছে।

৭ই নভেম্বর আমাদের জীবনে একটি প্রত্যয়ের দিন, একটি মুক্তির দিন এবং একটি সত্য প্রতিষ্ঠার দিন। এদিনকে সামনে রেখে মানুষ সকল সংশয়মুক্ত হয়ে দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় নিজেদের একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ নির্মাণ করবার জন্য প্রস্তুত করবেন। ৭ই নভেম্বর আমাদের জীবনের একটি প্রত্যয়ের দিন এবং একটি আশ্বাসের দিন। এই দিনকে যারা অবলুপ্ত করতে চেয়েছিল তারা দেশপ্রেমিক নয়। আজ আমরা সুযোগ পেয়েছি এ দিনটি সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য। এই দিনে আমরা বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমরা শঙ্কিত না হই এবং সাহসিকতার সঙ্গে যেন সর্বনাশের সম্মুখীন হতে পারি।